নিরুপম যাত্রা

বছর চারেক পরে কলকাতার থেকে দেশে ফিরছে—সম্বল একটা টিনের সুটকেশ, রংচটা শতরঞ্জিতে মোড়া একটা বিছানা এবং মানিব্যাগে তিন টাকা সাড়ে ন আনার পয়সা। একটা বিষয়ে খুব স্বাধীনতা আছে—কলকাতার থেকে চলে যাচ্ছে বলে কোনো উপরওয়ালার অনুমতি দরকার নেই; কোনো উপরওয়ালা নেই, চাকরির বিড়ম্বনার থেকে জীবন নির্মুক্ত—বেশ ঝরঝরে নির্মল দিনগুলো—যতক্ষণ ইচ্ছা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে, ফাল্গুনের সোনালি রোদে মাছির মত ঘুরে বেড়াতে পারে, মেসের বারান্দায় চড়াইদের নির্বিবাদ নিশ্চিন্ত জীবনোপভোগ সমস্ত দীর্ঘ অলস দুপুরবেলা বসে উপলব্ধি করতে পারে। একটি অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় কলেজ স্কোয়ারের একটা বেঞ্চিতে বসে সমস্ত সকাল অশ্বত্থের খড়-খড়ে ডাল-পালার ভিতর বাতাস ও বুলবুলিগুলোর গান শুনতে পায়—শুকনো পাতা ঝরে, সজীব পাতা গজায়, সবুজ বেঞ্চির ওপর খয়েরি রঙের, বাদামি রঙের পাতা উড়ে আসে, খানিকটা দূরে দেবদারু গাছটা ছোট নিটোল, শিমুলের ডালপালার পাতা নেই—অসংখ্য লাল ফুলের নিশান, কৃষ্ণ শিখার মত কাকের পাখাগুলো সাপের ফণার মত সারাদিন ঘুরছে, বিলম্বিত সকাল এখানে নির্বিবাদে কাটিয়ে দিতে পারা যায়—কেউ কোনো কৈফিয়ৎ নিতে আসবে না, রাস্তার ট্রামে-বাসে অফিসমুখী কেরানিদের জীবনের ঊর্ধ্বশ্বাসকে একটা অবাঞ্ছিত বিকৃত অনিয়ম বলে মনে হবে, দেবদারু গাছের লীলা ও ভঙ্গি, জীবনরচনার প্রণালী মনে হবে গভীর সত্যিকারের জিনিস, অশথ-অশথের বুলবুলিগুলোর জীবন সত্যিকারের মনে হবে, তার নিজের জীবনটাকে সত্যিকারের মনে হবে। সমস্ত রাত মেসের ছাদের ওপর মাদুর পেতে শুয়ে থেকে একটা দূর ভবিষ্যৎ জীবনের আভা পেতে পারে—গোলদিঘির দেবদারু ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাম গাছগুলো যার আভাস পায়, এই শহরের শিশির ভেজা অজস্র কাকের নীড় এমনি গভীর গহন রাতে যে-পরিপূর্ণতার স্পর্শে সুন্দর নিবিড় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দিনগুলোকে এমনিভাবে চালালেও চলে। চালাতে প্রভাতের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিপদ এই যে সামান্য দাড়ি কামাতে, একটা দেশলাই বা ব্যবহার করতেও যার সাহায্যের দরকার, সেই পয়সাই নাই। বয়স ত্রিশ বছর—আরো কুড়ি কি ত্রিশ বছর যদি সে বাঁচে তা হলে তিন টাকা সোয়া ন আনায় হয় না।

নিজে একা মানুষও নয় সে; স্ত্রী আছে—একটি ছেলেও রয়েছে।

এই চার বছর কলকাতায় কবিত্ব করে আর বুলবুলির গান শুনে কাটায় নি সে। শুধু আর্থিক অধঃপতনের অপরাধে আত্মিক জীবনের অমর্যাদা ও গ্লানি সহ্য করতে যারা অভ্যস্ত তাদেরই একজনের মত সারাদিন পথে-পথে ধাক্কা খেয়ে ফিরছে সে। সুখ-সুবিধা-সফলতা এই সব অর্জন করার জিনিস—পুরুষকারের দরকার—প্রতিদিন সকালবেলা এই দুরারোগ্য ছন্দ তাকে পেয়ে বসেছে; কেরোসিন কাঠের টেবিলে ডিটমারের লণ্ঠনটা নিভিয়ে অন্ধকারের ভিতর মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে প্রতিদিন রাতের বেলা মনে হয়েছে, এই অন্ধকারের যেন শেষ না হয় আর, এ বিছানার থেকে কোনোদিন যেন আর তাকে উঠতে না হয়।

সাধারণ বিশেষত্বহীন জীবনের বিশেষত্বহীন সাধারণ বেদনার অসহায় গভীরতায় চারটা বছর আস্তে-আস্তে এমনি করে কেটে গেল তার।

বাড়ির থেকে চিঠিপত্র বেশি কিছু পায় না সে। মা মাঝে-মাঝে লিখেছেন 'অনেক দিন তোমাকে দেখি না, মাঝে-মাঝে দেখতে ইচ্ছা হয়—সময় করে একবার আসতে পার না?'

বৌ-এর চিঠি, পনের-কুড়ি-পঁচিশ দিন অন্তর এক-এক বার আসে। 'কিছু সুবিধা হল? এত দিনেও তুমি যে কিছু করে উঠতে পারলে না এই ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই।'

তাই তো—

প্রভাত লেখে—'খোকা কত বড় হল?'

জবাব আসে—'কুন্দর চিঠি পেলাম আজ; তার স্বামী তো কলকাতায় গিয়ে ছ'মাসের মধ্যেই রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে কত বড় চাকরি জোগাড় করে নিল আর তুমি কিছু পারলে না।'

বেশ কথা। সেই যত উদাসীনতা দেখতে দেশে যেতে ইচ্ছা করে বড়। দেশে সে যাবে একবার—এবার একবার দেশে যাবে না কি? যাবে, যাবে। মার চিঠিতে হয় তো আগ্রহ বেশি নেই—কিন্তু একবার গিয়ে কাছাকাছি দাঁড়ালে তিনি উচ্ছ্বাসে বাঁধন-সম্বিৎহারা যদি না হন। আর এই কমলা— প্রথম দিনটা হয় তো সেই একটু মুখ গোঁজ করে সরে থাকবে—কাছে আসবে না, কথা বলবেও না; কিন্তু তার এ বিরসতা, উচ্ছে-চিবনো রূপ দু-এক দিনের মধ্যেই কেটে যাবে। তার পর চৈত্র-বৈশাখের নির্জন দুপুরবেলা-জামরুল পাতার মর্মর শব্দ, বোলতার গুনগুন, নারকোল গাছে কাঠঠোকরার ঠোকর, কামিনীগাছের ডালপালার ভিতর টুনটুনিগুলোর কিচিরমিচির—মাথার উপর কড়া রৌদ্র মাছরাঙার ডাক—বাতাসে নিদ্রালু মাঠ-প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ও স্বপ্নের হাহাকার! এমনি সময় দুপুরের বাতাসে অক্ষয় বটের প্রান্তরের সীমা পরিসীমায় আরো দূর অসংবদ্ধ প্রান্তর আকাশের বিস্তারকে টিটকারি দিচ্ছে—

আর খোকা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোকাকে ছ'মাসের দেখে কলকাতায় চলে এসেছিল প্রভাত—আজ বয়স তার প্রায় পাঁচ বছরের কাছাকাছি। হাঁটতে পারে—দৌড়াতে পারে—এমন কথা নেই যা সে না বলতে পারে। দেখতে কেমন হয়েছে? তার নিজের মত—না কমলার মত?

খোকা হয় তো কারো কথাই শোনে না; সকালে ঘুমের থেকে উঠে একটা বাঁশের কঞ্চি কুড়িয়ে নেয় নিশ্চয়। তার পর?

নয় তো বিড়াল, কুকুর, শালিক, কাক যা তার নজরে আসে—সমস্ত তাড়িয়ে বেড়াতে খুব ভাল লাগে তার। হয় তো পিঁপড়ে মারে—ফড়িং ধরার জন্য মেহেদি পাতার বেড়ার চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়—দু-একটা গঙ্গা-ফড়িং কিংবা নতুন ঝিঁ ঝিঁ যদি নজরে পড়ে তা হলে তার প্রতি লোভ আরক্তিম হয়ে ওঠে খোকার। এক-একটা প্রজাপতি উড়ে এসে আচমকা তাকে অন্য পথে ভুলিয়ে নিয়ে যায়; নানা রঙের প্রজাপতি; হলদে জর্দা, পাটকিলে নীল—কোনোটা লখনৌ ছিটের মত, চেককাটা, ফুটফুটে, ডোরাদার, কত কী! ফড়িংই-বা কত রকম—কোনগুলো টকটকে লাল, সমস্ত শরীরটা একটা পাকা ধানি লঙ্কার মত চারটি ডানা—আভের তৈরি নিটোল নিখুঁত জিনিসের মত—ভাঙে না, গুঁড়ো হয় না—ফড়িংটাকে মাঠের থেকে মাঠে-প্রান্তরের এ পারে, দিগন্তে, নদীর ধারে, শশার খেতে, বাবলার জঙ্গলে, শ্মশানে কত জায়গায়ই যে নিয়ে যায়!

ঘুরে ফিরে এই প্রজাপতি আর ফড়িংগুলো কানসোনার শিষে, দ্রোণ ফুলের ঝাড়ে, ঢেকি লতায়, আকন্দ ফুলে, ভেরেণ্ডাবনে এসে বসে, কিংবা লাউয়ের ডগায়, কিংবা বাঁশের মাচার একটা কঞ্চির উপরে! খোকা হয় তো এই সব দেখে-দেখে হয়রান—

একটা ফড়িংও ধরতে পারে না সে, তবুও হয় তো বর্ণচ্ছটাময় অজস্র প্রজাপতির জগৎ তার কাছে একটা সুন্দর সুদূর স্বপ্ন—সাম্পানচড়া মলয় নাবিকের চোখে দূর দক্ষিণ সমুদ্রের স্বপ্নের মত তাকে এড়িয়েই চলে, দিন-রাত এড়িয়ে-এড়িয়ে চলে—তার পর বিকেলের পড়ন্ত রোদের ভিতর দিয়ে সন্ধ্যার আবছায়া নেমে আসবার আগে কোনো পরীর রাজ্যে বিলীন হয়ে যায় সে। যাক। এই রকম বিলীন হয়ে যাওয়াই ভাল। একটা প্রজাপতি ধরে পাখনা ছিঁড়ে খোকার কী লাভ? তার চেয়ে এরা যদ্দিন শিশুটিকে মাঠে পথে ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে বেড়ায় বেশ হয়; খোকাকে ধরা দেবে না কখনো—তার মনের ভিতর নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা ও স্বপ্ন জাগিয়ে রাখবে; ভোরের থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে অনেক বহুরূপী রূপের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাবে—উঠানে, বাঁশবাগানে, চালতা তলায়, কিংবা লাল কুচ, সবুজ তেলাকুচা লতার দেশে কিংবা আমের বোলগুলো যেখানে সবুজ কটা ঘাসের ভিতর ঝরে শুকিয়ে মিষ্টি গন্ধ ছাড়ছে সেই রাজ্যে—

অবাক নিস্তব্ধ হয়ে ভাবছিল প্রভাত।

একটা পাতি লেবুর সবুজ পাতার উপর কমলা রঙের একটা প্রজাপতি—আজ এই দুপুরেই হয় তো খোকার কাছে তা জামশিদের মিনারের রাজ্যের চেয়ে ঢের বড় জিনিস। তার নিজের কাছেও ঐ রকমই মনে হত—খোকার বয়সে।

পৃথিবীর সাধারণ হাঁটা-চলার পথ-তুচ্ছ খুঁটিনাটি যতদিন অনাবিষ্কারের বিস্ময় কুয়াশা হয়ে থাকে, ততদিনই খুব গভীরে লাভ—ধীরে-ধীরে কল্পনা শুকিয়ে যায়—স্বপ্নগুলো যায় ভেঙেচুরে—বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি—তৃপ্তি পাই না, শান্তি পাই না, জীবনটা একটা দাঁড়কাকের বাসার মত ছন্নছাড়া জিনিস হয়ে দাঁড়ায়; সকাল থেকে রাত্রি অব্দি একটা ক্ষুধিত কাকের মত সমস্ত রকম কার্যতা, চিত্তপ্রসাদহীন লালসা ও গ্লানির ভিতর নিবৃত্তি খুঁজে মরি, জীবনকে বুঝি জীবনধারণ বলে।

প্রভাত মেসের বিছানায় এ-পাশ ও পাশ করতে লাগল। আজকের গাড়িতেই সে দেশে চলে যাবে। যাওয়া যায় না?

ট্রেন ছাড়ে প্রায় বিকেলে চারটের সময়—এখন বেজেছে দুটো। প্রভাত একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিল। ঘণ্টা দেড়েক সময় আছে আর। যাবে কি সে? আজই যাবে? কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে হেঁটে চলে গেলেই হয়—সময় ঢের বাকি আছে গাড়ি ছাড়বার। কালকে কমলার একটা পোস্টকার্ড এসেছিল—তোশকের নিচের থেকে পোস্টকার্ডটা বের করল প্রভাত—প্রভাত যে দেশে যাবার সংকল্প করেছে এ তাদের কল্পনার ত্রিসীমানায়ও নেই; বরং অনুযোগ করে লিখেছে এতদিনেও কেন সে চাকরি জোগাড় করে উঠতে পারল না? বিয়েই—বা করেছিল কেন? ছেলেও তো হয়েছে দেখি? কী দিয়ে কী হয়? কে কোথায় দাঁড়ায়?

চুরুটে এক টান দিয়ে পোস্টকার্ডটা রেখে দিল প্রভাত—

চুরুটে এক টান দিয়ে ভাবল—পোস্টকার্ডে এ-সব লেখা উচিত হয় নি কমলার। এটা তো একটা মেস—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন মানুষ থাকে। পিয়ন এসে চিঠিপত্র একটা ঢাকনা খোলা টিনের বাক্সে ফেলে দিয়ে যায়—যে খুশি যখন খুশি চিঠি নেড়েচেড়ে দেখে—কার্ড পড়ার অভ্যাস অনেকেরই আছে। একখানা খামে লিখতে পারত কমলা—

যাক—আজ আর যাওয়া হয় না। মেসের হিসেব মিটিয়ে দেওয়া হয় নি সমস্ত; খানিকটা বাকি আছে। ভাড়ার টাকারও জোগাড় নেই। খোকার জন্যও কিছু ছবির বই, খেলনা কেনা দরকার। খেলনা মানে, এঞ্জিন কিংবা মোটর—পুতুল নিয়ে তৃপ্তি থাকার বয়স পেরিয়ে গেছে সে, কমলার জন্যও অন্তত একখানা শাড়ি না নিলে চলে না—আর যাবার জন্য একখানা গরদের চাদর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ পর্যন্ত এত কিছু সে পারবে না বটে, মায়ের জন্য একখানা কাপড় আর কমলার জন্য একখানা সুতির শাড়ি আর খোকার জন্য একটা বেলুন—শেষ পর্যন্ত সম্ভার এইটুকুতে গিয়েই ঠেকবে হয়তো।

প্রভাত চুরুটের থেকে খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলল। তারাপদর কাছ থেকে গোটা পনের টাকা ধার করে আনবে সে। বড় লজ্জা করে। তারাপদর সঙ্গে কলেজে একসাথে পড়েছিল সে—এক মেসেও ছিল অনেক দিন। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। স্ত্রী-সন্তান চাকরি-বাকরি ও ভাড়াটে ফ্ল্যাট নিয়ে সে আজ সফল মানুষ—প্রভাতের জীবন থেকে সে ঢের দূরে চলে গিয়েছে।

ঘড়িতে তিনটা বাজল ঃ না, আজ আর রওনা হওয়া যায় না, কলকাতা ছাড়বার আগে দাবি-দাওয়া মিটিয়ে রওনা হওয়াই ভাল, চোরের মত পালিয়ে যাবে না সে।

মেসের বাকি টাকা কটা বুঝিয়ে দিয়ে যাবে ম্যানেজারকে। দেশের বাড়িতে গিয়ে যখন উঠবে সেই মুহূর্তেই একেবারে ভিখিরির মত আত্মবিক্রয় করে ফেলবে না সে: কয়েকটা মুহূর্ত অন্তত বেশ মহাজনের মত বাহুল্য থাকবে তার—খোকাকে বেলুন দেবে, লাটিম দেবে—

মাকে থান, কমলাকে খদ্দরের শাড়ি—

প্রভাতের হাতের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিয়ে ধীরে-ধীরে খবরের কাগজটা তুললে সে। সকাল থেকেই বাড়ি যাওয়ার ঝোঁকে আছে—সেই থেকে এই অব্দি খবরের কাগজের একটা লাইনও তার মাথার ভিতর ঢোকে নি—কাগজটাকে নেড়েচেড়ে দলেমুচড়ে তছনছ করে রেখেছে সে। গুছিয়ে নিল।

টেলিগ্রামের পাতাটা খোলে—এডিটরের আর্টিকেল কী, একবার তাকিয়ে দেখে। কিন্তু পড়বার চাড় নেই। কাগজ হাতের থেকে মেঝের উপর পড়ে যায়—চুরুটের থেকে আগুনের ফুলকি কাপড়ের উপর গিয়ে পড়ে—কাপড়ের খানিকটা—খানিকটা জায়গায় আলপিনের মাথার মত ছোট-ছোট ছ্যাঁদা হয়ে যায়—ক্রমে চুরুটও নিভে যায়—

প্রভাত কলকাতার দূর দিগন্তের একটা সুরকিধূলিরক্তাক্ত ঝাউ গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে—

দেশে সে যাবেই। আজ অবিশ্যি যাওয়া হল না। কালও হয় তো হবে না। তারাপদর কাছ থেকে টাকা ধার করে এনে তিন-চার দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই রওনা দেবে সে। বিকেল চারটের সময়ও শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেনের গায় বেশ চড়া রোদ—থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টের থেকে কেমন একটা গন্ধ বেরয়। দেশে যাবার জন্য যখন সে এই ট্রেনে চড়ত এই ঘ্রাণ এত ভাল লাগত তার—পড়ন্ত রোদ ভারী মিটে মনে হত—

হঠাৎ এক সময় গাড়ি একটা ঝাঁকুনি খেয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে যেত—তার পরই কামরার বেঞ্চিগুলো রোদে যে ভরে—মুখে রোদ, মাথায় রোদ। কেমন নরম রোদ—আঘাত দেয় না—বোনের মত, মায়ের মত সস্নেহে সমস্ত শরীর বুলোতে থাকে যেন—হৃদয়ের ভিতরেও একটা গম্ভীর ভরসা আসে—এখন থেকে আর সংগ্রামের দরকার নেই—চিন্তার প্রয়োজন নেই—উপায় খুঁজবার আবশ্যকতা নেই—জীবন এখন থেকে বেশ নির্বিবাদ নিশ্চিন্ত—নরম রোদ এসে আশীর্বাদ করে, ভালবেসে, এক সুদূর শান্তির দেশে নিয়ে চলেছে—

দেখতে—দেখতে বি-কে, পালের বাগান—নারকেলের সারি—পামবীথি—পশ্চিমের ধোপাদের কাপড় কাচার ঘাট—ধোলাই কাপড়-ঢাকা সবুজ ঘাস-দমদম স্টেশনে ট্রেন ধরে এক বার-তার পরেই হুম হুম করে মুহূর্তের ভিতর খোলা পৃথিবীতে এসে পড়ে—দু'ধারে মাঠ-প্রান্তর—খেজুরের জঙ্গল—আখের খেত, বড়-বড় সৌদাল গাছ, পাকুড়, ঝরঝরিয়া ও অর্জুনের বন—নিস্তেজ বিকেলবেলার কোল থেকে নেমে পৃথিবী ভরা সোনালি রোদের হুড়োহুড়ি—শূন্য ধান ক্ষেত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাশ, খড়ের স্তূপ, পাঙ শালিখগুলোর ওড়াওড়ি—

তার পর রাত্রি নেমে আসে—অবসন্ন ঝিঁঝির ডাক, কোকিলের গান ও ব্যাঙের কলরবের ভিতর দিয়ে মাঠ-প্রান্তরের সীমানায় জোনাকিমাখা বাতাসের ভিতরে ট্রেন এসে থামে। তার পর স্টিমার—এ এক নিরুপম বিচিত্র যাত্রা—মাঠ আছে, তেপান্তর আছে;

সমস্ত রাত বিচিত্র সরীসৃপের মত একেঁ-বেঁকে নদী যেন তিমিরাবৃত শীতল পাতাল দেশের দিকে চলেছে—

চুরুট নিভে গেল বুঝি?

কিন্তু জ্বালাল না আর প্রভাত—

সকালবেলা গিয়ে স্টিমারে দেশের স্টেশনে পৌঁছায়। স্টেশনে নেমেই সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটা চোখে পড়ে-ফাল্গুন মাসেই সেটা ফুলে ভরে যায়—

এক দিকে একটা ডালপালায় মস্ত বড় শিমুল গাছ—মাঘের শেষেই নীল আকাশের মাথায় আগুন লাগিয়ে দেয় যেন; এমন রক্তাক্ত শিমুল কোথাও কোনোদিন সে দেখে নি আর ঃ বনে সিন্দুর-মাখা সুন্দরী সধবার লেলিহান চিতা জ্বলে উঠেছে।

স্টেশনের ধারে এই শিমুল গাছটার বয়স ঢের। ছোট বেলার থেকেই দেখে এসেছে প্রভাত—'দাঁড়কাক ঠুকরে ফুল ছিঁড়ত—ফুল পাকত—ফল শুকনো হয়ে ফেটে আকাশে বাতাসে তুলো ছড়াত; এক দল ছেলেমেয়ের হাসি-ঝগড়া—তলবর এই ফুল ও তুলোর সঙ্গে কত দিন এসে মিশেছে যে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে যে কবেকার কথা! পনের-কুড়ি বছর আগে একটা পৃথিবী প্রভাতের চোখের সামনে জেগে ওঠে, সেই পৃথিবী আজ মরে গেছে। সেই বালক-বালিকার ভিড় আজ নর-নারীত্বে পর্যবসিত—পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—শিমুলের ফুল ও তুলো আজ তাদের কাছে সবচেয়ে উপেক্ষার জিনিস। কেন এ রকম হয়?

দিঘির পাড়ের অশ্বত্থের সব চেয়ে মোটা ডালগুলো তখন জন্মায়ও নি, কেওড় বাবলার বন কতবার পেকে গেছে তার পর, ঝরে গেছে কতবার, কত জল-মেটুলি সাপ মরে গেছে, কত পুকুর শুকিয়ে গেছে, কত শালিখ কোকিল অন্তর্হিত হয়েছে, বিশ্বম্ভরবাবুর সাদা গোঁফ জোড়া তখন কাচ-পোকার মত নীল ছিল, গায়ে ছিল অসুরের মত শক্তি—এখন তিনি চোখে দেখেন না, লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতে হয়, সেদিন একটা ভেড়ার টুঁ খেয়ে রাস্তায় গেলেন পড়ে—

ষ্টিমারের সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে তার পর সেই জেটি—চটের বস্তার গুদাম—চট ও আলকাতরার গন্ধ সেখানে; কত দিন সে-ঘ্রাণ পায় নি সে; আজ এই মেসের কামরায় বসে তা কত কাছের জিনিস মনে হয়—

জেটির থেকে বেরিয়ে তক্তার সিঁড়ি ধরে তার পর ষ্টেশনে লাল কাঁকরের রাস্তায়; রাস্তার দু'ধারে কৃষ্ণচূড়া আর ছাতিমের সারি; সবুজ ঘাসের উপর কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুলগুলো ছড়িয়ে থাকে; মস্ত বড় পল্লবিত ছাতার মত কৃষ্ণচূড়ার মাথাগুলো সবুজ পাতার নিবিড় ঘাসে নিরবচ্ছিন্ন রক্তিম ফুলের আভায় নীল আকাশের গায় খেলা করে; ছাতিম গাছের নিচে প্রতিবারই এক দল নিরীহ ভেড়া ও ছাগলের ভিড় সে দেখে-গুলো কার যে জানে না সে। চুপচাপ বসে থাকে, ফুল খায়, ঘাস চিবোয়, প্রভাতের দিকে মুখ তুলে নিরপরাধ চোখের শান্ত অভ্যর্থনায় তাকায়।

সেই ভেড়া ও ছাগলগুলোকে এবারও গিয়ে দেখতে পাবে না কি সে? গতবারও দেখেছিল; তার আগে আরো কতবার দেখেছে যে সে!

ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি ঢের; প্রভাতকে ষ্টিমার থেকে নামতে দেখলে ঝিলকান্দি রোডের আস্তাবলের গাড়োয়ান কালিম সবচেয়ে আগে ছুটে আসত; এবারও আসবে নিশ্চয়; মুখে তার ক্রমাগত—'মহারাজ—হুজুর,' 'মহারাজ—হুজুর'। নিজের হাত দুটো জোড়া করে অনবরত কচলাতে থাকে কালিম, কেন এলাম, কেমন আছি, দেশে কদ্দিন থাকব—সে কত জিজ্ঞাসা তার। ঢের উচ্ছ্বাস; প্রভাতদের বাড়ির সবাই যে ভাল আছে সে কথা আগারি জানিয়ে দেয় প্রভাতকে সে; শামশ রঙ—জোয়ান চেহারা—উড্ডীন বাজপাখির মত দিব্যি চমৎকার মুসলমান যুবা; কালিমকে দেখলে মনটা খুব তৃপ্তি পায়—

কিন্তু এবার আর গাড়িতে চড়া যাবে না; কালিমকে নিরাশ করতে হবে; পয়সা বড্ড কম; কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে বাড়িতে যেতে হবে।

চুরুটটা জ্বালাল প্রভাত।

একটা টান না দিয়ে ভাবল সেই কুকুরটা বেঁচে আছে তো? বাবা তার নাম রেখে গিয়েছিলেন 'কেতু'—সেই থেকেই সবাই' 'কেতু' 'কেতু' বলে ডাকে। বাবা আজ নেই। কুকুরটাও ঢের বুড়ো হয়ে গিয়েছে বোধ করি—

বেঁচে আছে তো? কমলা এ—সব প্রশ্নের কোনো উত্তরই দেয় না। কুকুর-বিড়ালকে সে জীবনে গ্রাহ্য জিনিসের মধ্যেই ধরে না।

কেতুর যখন দু-তিন মাস বয়স মোটে, সারা রাত এমন চিৎকার করে অস্থির করত মানুষকে—প্রভাত এক দিন রাগ করে বারান্দার থেকে বাচ্চাটাকে উঠানে ছুঁড়ে মেরেছিল। মরে নি; কিন্তু একটা পা ভেঙে গেল। কত রকম ফিকির, চেষ্টা, কিন্তু সে পা আর জোড়া লাগল না। কুকুরটি বড় হয়েও খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে—চার বছর আগে দেখে এসেছিল প্রভাত-কুকুরটার বেশ স্ফূর্তি-আনন্দ—জীবনোল্লাস কিন্তু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে গিয়ে ল্যাং ল্যাং করে—একটা অপ্রীতিকর বাধা সব সময়েই বহন করতে হয় বেচারিকে—

বাড়ি গিয়ে কুকুরটাকে এবার মাছের কাঁটা দুধ-ভাত নিয়মিত দেবে সে; খোঁড়া পায়েরও একটা ব্যবস্থা করা যায় না কি? দেখবে সে। বাস্তবিক, কেতু যেন মাঝে-মাঝে এ মেসের কামরার ভিতর থেকেও প্রভাতকে টানে—কী যেন বোবার কথা জানাতে আসে ঃ হয় তো উচ্ছিষ্টমাখা ভাত আজ-কাল আর জুটছে না তেমন, হয় তো তিন-চার দিন না খেয়েই থাকতে হয়, হয়তো খিদের লোভে মরা বিড়ালের মাংস খায়, শকুনদের ভাগাড়ের চারদিকে ঘোরাঘুরি করে, গরুর ঠ্যাং কুড়িয়ে আনে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ায় বসে সমস্তটা দুপুর চিবোয় তাই—তার পর বিকেলের ছায়া স্তিমিত হয়ে নেমে আসে যখন, তখন বাঁশ ও কাঁঠালের জঙ্গলের কিনারে বসে অবাক হয়ে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকে হয় তো—ঘণ্টার পর ঘণ্টা আশ্চর্য হয়ে ভাবে; কোথায় সে গেল? এই চার বছর ধরেই তাকে খুঁজছি, তবুও দেখা পাই নে কেন? কোথায়?

ধীরে-ধীরে চোখ বোজে হয় তো কেতু; ঘুমায় না; মাটির ওপর শুয়ে জিভ বের করে ভাবতে থাকে হয় তো এত দিন মানুষের কাছ থেকে সে যত অকল্যাণ ও গ্লানি পেল প্রভাত এলে সমস্ত জানাবে তাকে সে—

বাঁশের সবুজ পাতা ঝিরঝির করে বাতাসে বাজতে থাকে; ধূসর আকন্দ ফুলে ডোমরা গুন-গুন করে মরে; সজনে গাছের সাদা ফুলগুলো বাতাসে উড়তে থাকে, শুকনো বন চালতা ও কদমের পাতা ঝরে পড়ে, জঙ্গলের থেকে গোটা দুই বেজি বেরিয়ে আসে, ডাহুকের বাচ্চাগুলো কাঁদতে থাকে—আমের বকুল ঝরে, কেতু গা ঝাড়া দিয়ে তার ব্যথিত বিচ্ছিন্ন নিদ্রার থেকে উঠে বসে—বিহ্বল হয়ে চারিদিকে তাকায়—সন্দিগ্ধ হয়ে ভাবে এ গাঁয়ে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর নেই; কিন্তু এ চার বছরের ভিতর আশেপাশের কত গাঁ খুঁজে এসেছে সে—সে মানুষকে সে কোথাও ত পেল না; খানিকটা দূরে একটা শুকনো কচ্ছপের চাড়া পড়ে আছে—শ্রদ্ধাহীনভাবে সেটার দিকে তাকায় বোধ করি কুকুরটা। একবার হাই তোলে, ভোমরার গুনগুনানি কানে ভেসে ভাসে; হলদে প্রজাপতিটার অক্লান্ত ওড়াউড়ির দিকে অবসাদ ভরে তাকিয়ে দেখে; তার পর খামোকা লাফিয়ে উঠে শুকনো পাতার উপর দিয়ে খামচ-খামচ করে হেঁটে মস্ত বড় যজ্ঞডুমুরের গাছটার পিছনে প্রান্তরের দিকে অন্তর্হিত হয়ে যায়—

কেতুর কথা ভাবতে গিয়ে চরুটে আর টান দেয় নি প্রভাত; চুরুটটা নিভে গেছে।

সেই নিরঞ্জন ধোপার দিন কাটছে কেমন? সেই চার বছর আগে দেখা। পাটের দর কমে গেছে বলে সে ত বড্ড ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছিল; পাটের চাষ সে অল্প-স্বল্প করত বটে—কিন্তু তা এত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর যে অতখানি ক্ষুব্ধ হবার কোনো কারণ ছিল না তার; অবিশ্যি সমস্ত বাজারই মন্দা—সকলেরই দারিদ্র—জীবন্মৃত অবস্থায় মানুষকে বাঁচতে হয়ঃ সেই-ই হয় তো তার বিক্ষোভের কারণ ছিল। এ জীবনে নিরঞ্জন কত পার্টই যে নিল, ছ'বছর বয়সে পালিয়ে গিয়ে যাত্রার দলে ঢুকল—ভাল গাইতে পারত বলে নবীন অধিকারীর দলে তার খুব আদর হয়েছিল—প্রভাতও লক্ষ্মণবর্জনে নিরঞ্জনের গান শুনেছে; সে প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা; কিন্তু আজও মনে হলে চুপচাপ বীরব হয়ে বসে থাকতে হয়, হয় তো আজই সেই জিনিসের মূল্য সবচেয়ে বেশি।

নিরঞ্জনের গানের গলা দু-তিন বছরের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেল—অভিনয় সে করতে পারত না—যাত্রার দল থেকে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল—এর পর নিরঞ্জন অন্য এক অধিকারীর দলের জল টেনে, বাসন মেজে, কাপড় কেচে, পান বানিয়ে, তামাক সেজে ফোঁপড়-দালালি করে বেড়াত।

কিন্তু এ সব ভাল লাগল না তার।

তবুও যাত্রার দলের গন্ধ সে সহজে ছাড়তে পারল না। কিছু দিন সে দিন আঁকতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে তার জীবনের সবচেয়ে নিরেট ব্যর্থতা। নিজে একটা যাত্রার দল খুলবে বলে ঠিক করল—কিন্তু অতিরিক্ত মোড়লি করতে গিয়ে পণ্ড হয়ে গেল সব।

একবার প্রভাত শুনল—নিরঞ্জন কলকাতায় পালিয়ে গেছে। প্রভাত তখন স্কুলে পড়ে। কলকাতার থেকে যারা আসে তারা খবর দেয়, নিরঞ্জন থিয়েটারে ঢুকেছে। কলকাতা শহরে খুব নাম করে ফেলেছে সে; আধাআধি কলকাতার বাসিন্দা তাকে চিনে নিয়েছে। একদিন হঠাৎ স্কুলে যাবার পথে নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা—পরনে একটা কপাসডাঙার চুড়ি পাড়ের কাপড়—গায়ে গলাবন্ধ আলপাকার কোট—পায়ে নিউকাট [?]-বার্ডসাই মুখে।

নিরঞ্জন খুব চাল দিল না কলকাতার; প্রভাতকে খুব খাতির করল—বার্ডসাই সাধল-বললে, 'লেখাপড়া না করলে মানুষ হতে পারা যায় না—বাস্তবিক!'—'স্কুলে কোন ক্লাসে কী রকম মাইনে দিতে হয় জিজ্ঞেস করল, যে-ক্লাসে সবচেয়ে কম মায়না সেই ক্লাসেই ভর্তি হবে বলল; প্রভাত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি ভর্তি হবে একটা পাড়া-গাঁয়ের স্কুলে—কলকাতায় তোমার এত নাম!' নিরঞ্জন মাথা নেড়ে হেসে বললে—'না, ও ঠাট্টা করছিলাম—এখানে একটা এ্যামেচার থিয়েটার কোম্পানি খুলব ভাবছি।'

এ্যামেচার কথাটির মানে তখন জানত না প্রভাত—অবাক হয়ে নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল; নিরঞ্জন কলকাতায় গিয়ে ইংরেজিও শিখে ফেলেছে ঢের।

স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছে একটা খেজুর গাছের আড়ালে দু'জন গিয়ে দাঁড়াল, প্রভাত বললে—'বাঃ কলকাতায় এত নামগাম করে এসে পাড়া-গাঁয়ে থিয়েটার খুলবে? এ আবার কী ছাই?'

নিরঞ্জন সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলেছিল—'দূর! তোমার সঙ্গে একটু মশকরা করলাম। এখানে আমার এজেন্ট রেখে দেব। আমার নিজের থিয়েটার থাকবে কলকাতায়।'

কয়েকদিন পরে স্কুল থেকে ফিরবার পথে প্রভাত দেখল পিঠে এক বস্তা নিয়ে চলেছে নিরঞ্জন—

অবাক হয়ে সে থমকে দাঁড়াল, নিরঞ্জন না?

—'কী হে, এ কিসের বস্তা তোমার পিঠে?'

—'আর কিসের?'

সেই থেকে ধোপার কাজ সে করছে।

মাঝখানে ইস্টিমারের ডকে একবার কাজ পেয়েছিল—মাসে পনের টাকা মাইনের কাজ পেয়ে নিরঞ্জন আবার গোলাপবাহারি বাবুগিরি আরম্ভ করে দিল।

কিন্তু অতিরিক্ত বাহাদুরি করার অপরাধে ডকের থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর তার বয়স বাড়তে লাগল; বিয়ে করল—ছেলে-পিলে হল; লক্ষ্য করে দেখছিল প্রভাত—নিরঞ্জন ঢের বিজ্ঞ ও নিস্তব্ধ হয়ে উঠছে; মানুষের জীবনটাকে মনে-মনে পর্যালোচনা করে সে—অত্যন্ত গম্ভীর নানারকম সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হয়।

প্রভাত তাকে 'তুই' বলে ডাকে, নিরঞ্জন প্রভাতকে 'হুজুর' বলে সম্মান করে—'আপনি' বলে সম্ভাষণ করে; হাত তুলে নমস্কার জানায়, 'যে আজ্ঞে' বলে আদেশ গ্রহণ করে, এই সমস্ত সম্পর্কে একজনেরও কারো মনে কোনো খটকা নেই—ঘনিষ্ট কথাবার্তাও দু'জনের মধ্যে কম হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর চারেক আগে, দোলের দু-তিন দিন পরে সে এসেছিল, কতকগুলো রং-মাখা জামা বের করে প্রভাত বলেছিল,—'পারো কি এমন রং ওঠাতে—'

'সে নেড়েচেড়ে বললে—'খুব পারব হুজুর।'

—'গায়ে দেবার আমার একটা জামাও নেই কিন্তু, খুব শিগগিরই দিয়ে যাবি।'

—'পরশুই দেব হুজুর।'

দিন পনের পর এসে সে হাজির।

প্রভাতের শর্ট-পাঞ্জাবি—ফতুয়া সব কটিই গাঁটরির থেকে বের করে নির্বিকারভাবে একটা শতরঞ্জির ওপর রাখল নিরঞ্জন।

লাল, নীল, সবুজ রঙের জলুশ জামাগুলো গায়ে যেন আরো সুঠাম হয়ে উঠেছে। প্রভাত চোখ নরম করে—'হারামজাদা এই কাচলে নাকি তুমি?'

—'হুজুর।'

—'হুজুর কী রে শুয়ার, পাজি, উল্লুক, তুমি বললে পরশু দিয়ে যাবে, এনেছ পনর দিন পর, তাও এই রকম—'

—'হুজুর, কাচতে দিয়েছিলাম আমার ভাইপোকে।

—'কেন, তাকে কাচতে দিলে কেন তুমি?'

—'ভাবলাম, ওকে লায়েক করে নেই—আমি মরলে পর ধোপার কারবারটা ওই ত রাখবে—'

—'বেশ এক দফা মিথ্যা কথা বললে যে!'

—'বিশ্বাস হয় না মহারাজ?'

—'ভাইপোকে কাচতে দিলে তুমি, দেখিয়ে দিলে না কেন?'

—'আমি ছিলাম না মহারাজ।'

—'কোথায় গিয়েছিলে!'

—'গতবার জামাইষষ্ঠীর সময় শ্বশুরমশাই আমার তত্ত্ব-তলব নিতে পারেন নি, মনে বড় দুঃখ ছিল তাঁর, এবার তাই জামাই খাওয়ালেন।'

—'জামাইষষ্ঠী এখন কী রে! এত মোটে ফাল্গুন মাস-'

—'তা তিনি খাওয়ালেন ত।'

—'কদ্দিন ছিলে সেখানে?'

—'এই চৌদ্দ দিন ছিলাম—কাল ফিরে এসে ভাইপোকে ঝাঁটা মেরেছি মহারাজ—কী ঝামেলা বলুন তো—রঙের একটু পোচড় অব্দি তুলে দিতে পারে নি—'

চুপ করে ছিল প্রভাত।

নিরঞ্জন—'আমাকে দিন—দু'দিনেই ফকফকে সাদা করে এনে দিচ্ছি—'

—'না, তোমাকে আর দেব না নিরঞ্জন।'

—'পরশুই এনে দিচ্ছি মহারাজ—একটা রঙের আঁশও যদি থাকে তবে আমার দুটো কান আমার পায়ের নিচে কেটে রেখে যাব।'

কিন্তু রঙের একটা আঁশও সে ওঠাতে পারে নি।

পরে প্রভাত বলেছিল—'আচ্ছা লেবুর রসে রং ওঠে যে!'

মাথা নাড়ে নিরঞ্জন—'তা কি হয়? রঙ পেকে যায়!'

—'আমরুল পাতার রসে?'

—'টক জিনিসে রং পাকে—দিতে হয় জলের ছিটে; যত বড় বেয়াড়া রঙই হোক না কেন, কড়া রোদে তিন দিন জলের ছিটে দিয়ে ভাটিয়ে ফেললে—আচ্ছা, দেখবেন? আপনার জামাগুলো দিন, আমি তিন দিনেই রং তুলে দিচ্ছি—'

নিরঞ্জন এই রকম।

একবার একটি মশারি কাচতে নিয়ে প্রভাতকে বড্ড বিপাকে ফেলেছিল সে; ভোরের বেলা মশারি নিয়ে গেল, বললে,—সন্ধ্যাসন্ধি দিয়ে যাব। কিন্তু তিন সপ্তাহের ভিতরে তার কোনো দেখাই নেই।

লোকটিকে খুব ভাল লাগে তবুও; কাপড়ের বস্তা নিয়ে যখন সে হাজির হয় দু'দণ্ড বেশি বসিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে তাকে প্রভাতের রং বসতে সেও খুব রাজি...কত রকম গল্পই যে জানে? সামান্য জিনিসও গাঁজিয়ে সরস করে বলবার ক্ষমতা আছে তার। কেন কথক হল না সে? কিংবা মফস্বল কোর্টের মোক্তার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাত্রার দলে কিংবা থিয়েটারে যে-সব চলতি অভিনয়—তার চেয়ে নিরঞ্জনের এই হাট-বাজার ব্যর্থতা-বেদনা জীবন-মৃত্যুর কথা কত বেশি স্পট, মৃত্তিকাগন্ধী, গাজনের রসে ভরপুর—

ধোপার কাজ এর জন্য নয়।

এবার দেশে গিয়ে জামপুরের হাটের পথে নিরঞ্জনকে পাকড়াতে হবে—সেইখানেই সে আনাগোনা করে। তার পর তাকে ডেকে এনে বাড়ির পুব দিকের অশ্বত্থ গাছটার নিচে বসতে হবে এক দিন দুপুরবেলা; এ চার বছরের মধ্যে কোনো নতুন বিমর্ষতা পেয়ে বসেছে না কি তাকে? জীবন কি কায়ক্লেশে চলে না কোনো নতুন আত্মিক অর্থ শিখেছে? কাজে সে কি এখনো ফাঁকি দেয়? যাত্রা—থিয়েটারের জন্য মন উড়ু-উড়ু করে না কি আবার? জীবনটা নেহাত নিশ্বাস ফেলে বেঁচে থাকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে হয় তো। কিংবা, হয় তো কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছে; দাড়ি রেখেছে...বৈরাগী হয়েছে। যাই হোক না কেন, সে যত দিন বেঁচে আছে জীবনের হাট জমানো ব্যাপারের থেকে ফাঁকি দিয়ে সে কোথাও চলে যাবে না। মুখে তার গল্পের রং বদলাতে পারে কিন্তু ছাঁচ বদলাবে না—

নিরঞ্জন এমন সরস মানুষ!

চুরুটটা থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলল প্রভাত; অনেকক্ষণ ধরে নিভে রয়েছে চুরুটটা এবার জ্বালিয়ে নেয়া যাক....

দেশে গিয়ে এবার নানা রকম পুরোন জিনিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাকাতে ইচ্ছা করে। দেশের হাই স্কুলটা প্রায় চল্লিশ বছরের পুরোন। অনেক দিন স্কুলটার কোনো খোঁজ খবর রাখে না প্রভাত; কতকাল স্কুলটার মুখও দেখে নি সে। প্রায় বছর পনের-ষোল আগে সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাস করে সেই যে বেরিয়ে গেছে প্রভাত—এই ষোলটা বছর স্কুলের দিকে আর মাড়ায় নি সে—

দিন—রাত্রির ফাঁকে স্কুলটার কথা যখনই মনে হয় হৃদয়টা এমন নরম হয়ে পড়ে।

স্কুলের সামনের প্রকাণ্ড মাঠটার কথা মনে পড়ে; ছুটির পর বিকেলবেলার সফেন সোনালি রোদের ভিতর অলস মাছির মত তারা কয়েকজন মাঠের এক কিনারে বই ছড়িয়ে বসে থাকত মাঝে-মাঝে; মাঠটার সেই সবুজ কটা ঘাসের গন্ধ ধূসর খড়ির মত মাটির ঘ্রাণ—শুকনো ফুল ও নিম-পাতার স্তূপ—লাল বট ফলের গন্ধ—সেদিন এ-সব বড় একটি গ্রাহ্যের জিনিস ছিল না। কিন্তু আজ এই সবের কিনারে বসে ধীরে-ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেও ভাল লাগে।

এর চেয়ে নিবিড় সুন্দর সফল পরিসমাপ্তি কোথাও নিয়ে যেতে পারে না আর।

মাঠটার কিনারে একটা মস্ত বড় তেঁতুল গাছ ছিল—কী যে মিষ্টি তেতুল—টিফিনের সময় রমেন, অবিনাশ, ইয়ুসুফ আর প্রভাত ঢিল ছুঁড়ে তেঁতুল পেড়ে গাছের ছায়ায়-ছায়ায় চুপচাপ গিয়ে বসত—

সেই তেঁতুল গাছটা আছে আজ?

ড্রিল মাস্টার ছিলেন দ্বিজেনবাবু। লম্বা-চাওড়া জোয়ান চেহারা—পাঞ্জাবি পালোয়ানের মত দেখতে, হাতে সব সময়ই একটা বেত থাকত; উঁচো ছেলেদের দু-তিন ঘা লাগাতেন মাঝে-মাঝে—কিন্তু এমন মোলায়েমভাবে যে তাতে চামড়া জ্বলত না কখনো, সুড়সুড় করত শুধু; বেত নিয়ে আস্ফালন করতেন বেশি—ছেলেদের ধরে মারা তার ধাতে একদম ছিল না। ছেলেদের সারিবন্দী সাজিয়ে কুচকাওয়াজ করাতেন—কখনো রাইট টার্ন, কখনো লেফট টার্ন, অ্যাবাউট টার্ন, মাঝে-মাঝে 'ইস্ট' বলে চিৎকার করে উঠতেন। চমৎকার আবহাওয়া সৃষ্টি করে ফেলতেন তিনি; প্রত্যেকেই নিজেকে চোস্ত পদাতিক বলে মনে করত—কোথাও একটা সঙ্গীন লড়াই করতে চলেছে। প্রভাত মনে-মনে ভাবত ভবিষ্যৎ জীবনেও সে এমনি কাওয়াজ করবে—কাঁধে বন্দুক ফেলে মার্চ করে চলবে—সৈন্য হবে—কে জানে হয় তো নেপোলিয়ন হবে কিংবা মার্শাল নে—

বেশ দিনগুলো ছিল সব।

আবার সব পেতে ইচ্ছা করে। জীবনটাকে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে পারা যেত যদি।

দ্বিজেনবাবু কি বেঁচে আছেন?

এখনো ছেলেরা সেই মাঠে গিয়ে জড়ো হয়? ড্রিল করে? কী কথা ভাবে তারা? বুনো আনারস খুঁজে বেড়ায়? শুকনো বটপাতার চটের গন্ধ, ভাল লাগে তাদের?

তাদের জীবনের সংস্পর্শে আসতে ইচ্ছা করে বড়; সমস্ত নতুন মুখ—কিন্তু তাদের ভিতরেই সেই পনের বছর আগের স্কুলের ক্যাপ্টেন অবিনাশ বেঁচে রয়েছে, সেই অমূল্য বেঁচে আছে, রমেশ বেঁচে আছে, ইয়ুসুফ বেঁচে আছে—হয় তো তাদের ভিড়ের ভিতর থেকে কোনো গোধূলি নেশাক্রান্ত কলরবহীন স্বপ্নাতুর নিরালা কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রভাত তার পনের বছর আগের জীবনটাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য খুব তীব্রভাবে উদ্ধার করে নিতে পারবে।

চুরুটটা যেমন তেমনি নিভেই আছে। জ্বালানো হয় নি বুঝি? কই, দেশলাইটা কোথায়? দেশলাই বার করে এবার চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল প্রভাত।

দেশে যাবার সময় এবার খানিকটা ভাল চা নিয়ে যাবে সে; কমলাকে চা তৈরি করতে শেখাবে-পাতলা চা খেতে প্রভাত ভালবাসে-না—চা একটু কড়া হওয়া চাই-চায়ের পাতাও বেশ চমৎকার হওয়া চাই—তাজা দুধের চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেই ভাল। দিনের মধ্যে যতবার খুশি চা খাবে সে। কমলা হয় তো মাঝে-মাঝে মোড়া নিয়ে বসতে পারে—সে বড় মর্জির মানুষ।

একটা ছোট স্পিরিট স্টোভ কিনে নেবে প্রভাত-একটা ছোট কেটলি আর একটা পেয়ালা।

দেশে গিয়ে দুপুরটা কত রকমভাবে কাটানো যায়?

নবীন মজুমদারের বাড়ি গিয়ে ব্রিজ খেললে কেমন হয়? তাই করবে সে। মজুমদারের মস্ত বড় বাড়ি; টাকা-কড়ির সচ্ছলতা তাদের খুব-বাড়ির বুড়োরা সারা দিন শতরঞ্জ খেলে। আর ছোকরাদের ব্রিজের আড্ডা বার মাস লেগে রয়েছে।

রোজ-রোজ ব্রিজ খেলে অবিশ্য সে তৃপ্তি পাবে না।

এক-এক দিন দুপুরে বেরিয়ে পড়বে সে—ছোটবেলায় যে-পথ ধরে স্কুলে যেতে সেই পথটা ঘুরে আসবে—দীর্ঘ আঁকাবাঁকা রাস্তা—কোথাও কাঁকারের, কোথাও মাটির—কোথাও এক-একটা রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ মাঠ—তার পরে বাঁশের জঙ্গল-এক-একটা মস্ত বড় অশ্বত্থ—পাকা-পাকা বেত ফলে ভরা নিবিড় বেতের বন—ছোটবেলা স্কুল থেকে ফিরবার সময় খেতলা-খেতলা সাদা ফলগুলো ছিঁড়ে নিত সে—নুন মাখিয়ে খেত।

সে কত দিন হল বেত ফল খায় নি—চোখেও দেখে নি। এবার দেশে গিয়ে এক-একটা দুপুরে খানিকটা নুন নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে—নিস্তব্ধ বেতজঙ্গলের কাছে এসে একটা পল্লবিত হিজল গাছের ছায়ায় বসে বেত ফল খাবে সে। মনে হবে না কি সেই স্কুলের দিনগুলো জীবনের থেকে সাঙ্গ হয় নি এখনো তার? টিফিনের ছুটিতে বেতের ফল খেতে চলছে সে; খাচ্ছে: এক্ষুণি হয় তো অমূল্য আর বিজন এসে হাজির হবে; একটা মোটা গুলঞ্চলতা ছিঁড়ে হাতে জড়াতে-জড়াতে রুক্মিণী একবার দেখা দিয়েই গভীর জঙ্গলের ভিতর কাটা বহরের জন্য ঢুকে পড়বে...

বাবা অনেক বই দিয়েছিলেন—নানারকম ইংরেজি বই—হাক্সলি আছে, হার্বার্ট স্পেন্সার আছে, ডিকেন্সের সম্পূর্ণ সেট রয়েছে—স্কুলে যখন পড়ত প্রভাত, তখন ডিকেন্সকে কেমন কঠিন মনে হয়েছে তার;

—বড্ড দুর্বোধ্য—বুঝে উঠতে পারত না।

কলেজে উঠে ডিকেন্সকে উপেক্ষা করে গেছে; একটা বইও স্পর্শ করতে যায় নি তার; হিউগো পড়েছে, ডুমা পড়েছে, ফ্লবেয়ার পড়েছে,—ফরাসি উপন্যাস না পড়লে মনে উঠত না তখন—কলেজে ছেলেদের কাছে কেমন বাহাদুরিও বজায় থাকত না যেন। তার পর টলস্টয়, চেহভ, টুর্গেনিভ পড়ল—কিন্তু ডিকেন্সকে ছুঁল না। এম-এ পাস করে কলেজের থেকে বেরিয়ে কন্টিনেন্টের ঢের বই পড়ল সে....কিন্তু ডিকেন্স অস্পৃশ্য হয়ে রইল। আজ এই ত্রিশ বছর বয়সে ডিকেন্সের একখানা বইও তার পড়া নেই। ব্যাপারটা হয় তো বিশেষ লজ্জার কিছু নয়...কিন্তু এক-একবার প্রভাত অবাক হয়ে ভাবে বাবা অত সাধ করে ডিকেন্সের সমস্ত বইগুলো কিনলেন, পড়লেন, প্রাজ্ঞের মত অজড় অমর সংস্থিতি নিয়ে ডিকেন্সকে করেছিলেন যেন তিনি তার খাদ্য—কথাবার্তায় অনেক সময় ডিকেন্সের গল্প পাড়তেন। এ-রকম কেন? বইগুলো না পড়া পর্যন্ত কেমন যেন একটা কুজ্ঝটিকা কৌতূহল ডানা বিস্তৃতিকে দাবিয়ে রাখে। দেশের বাড়িতে গিয়ে এ কৌতূহল তৃপ্ত করতে হবে এবার...ডিকেন্সের অতগুলো বই, উই-আরশোলা ও চুরি-চামারির হাত থেকে বেঁচেছে: খুব স্থির নিরপেক্ষ বিচার নিয়ে পড়ে দেখবে প্রভাত...

এই বইগুলো নিয়ে কয়েকটা দুপুর বেশ ভরসার সঙ্গে কাটবে আশা করা যায়—

সন্ধ্যা হয়ে গেল—

বিছানার উপর শুয়ে পড়ে চুরুটটা ফুঁকে-ফুঁকে শেষ করতে রাত হয়ে যায়; তারাপদর কাছে আজ আর যাওয়া হল না।

পরদিন সকালবেলা তারাপদ কুড়িটা টাকা দিল—মেসের ম্যানেজার আট টাকা পায়, থার্ড ক্লাসের একটা টিকিটের জন্য সাড়ে চার টাকা রেখে বাকি টাকাগুলো দিয়ে প্রভাত একটা থান কাপড়, সুতির শাড়ি ও লাটিম বেলুন ছবির বই ইত্যাদি কিনে নিল।

ধার করার আগে হাতে তিন টাকা সোয়া ন আনা ছিল—টিকিট কেটেও তাহলে পাঁচ-ছয় টাকা হাতে থাকে—প্রভাত কলেজ স্ট্রিটের ওয়াই-এম-সি-এতে ঢুকে পাঁচ পয়সা দিয়ে চা খেল। ছোট এক কেটলি ভরা চা...প্রায় দু'কাপ আন্দাজ হল—বেশ চা খেতে-খেতে অনেকক্ষণ ফ্যানের নিচে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থেকে এই বিরাট পৃথিবীর জীবন ব্যাপারে চরিতার্থ একজন সার্থক জীব বলে মনে হতে লাগল নিজেকে।

কয়েকটা দামী চুরুট কেনা যায়; কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে গিয়ে একবার বসে, অশ্বত্থ-দেবদারুর দিকে তাকিয়ে দেখে, দিঘির চার কিনার ঘিরে মরশুমি ফুলের গাছগুলো ঢের বড় হয়ে উঠেছে—ফুরের সঞ্চার ঢের ত এবার—বিমুগ্ধ হয়ে উপলব্ধি করে নেয়। একটা চুরুট জ্বালায়, ছাঁটা-ছাঁটা মেহেদি গাছের ডালপালার ভিতর চড়াই না কি—তাকিয়ে দেখে একবার—দিঘির পুব-দক্ষিণ কোণে নারকেল গাছটাকে জড়িয়ে-জড়িয়ে লতাটা বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছে এদ্দিনে-কিন্তু দেশের পথেঘাটে এ রকম কত লতা, কত ঝুমকো ফুল! সুইমিং ক্লাবের ছেলেরা ওয়াটার পেলো খেলছে। একটা ভদ্রলোক, তার স্ত্রী ও দু-তিনটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে আছেঃ ছদ্র-লোকের মাথায় ছাতা, স্ত্রীর মাথায় ঘোমটা, ছেলেমেয়েদের মাথায় বাঁদর টুপি। কলকাতায় এরই নাম বোধ হয় মুক্ত বাতাস সেবন। আকাশ—বাতাস আলো-রৌদ্র যেন এখানে লিমিটেড কোম্পানির জিনিস; কাদের বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেয়ার—বড়-বড় ডিভিডেন্ড টানে, বিধাতা জানেন—বিধাতা একাই টানেন হয় তো-কেমন একটা চিমসে দরিদ্রতা ধরা পড়ে যেন এখানে –ভাবতে গেলে দম আটকে আসে যেন—আর তিন-চার দিন পর পাড়া-গাঁর মাঠ প্রান্তরের গভীর দাক্ষিণ্যের ভিতর হাঁটতে-হাঁটতে কলকাতার রাস্তা-ঘাট, ঘরবাড়ি ও জীবনের নিয়ম, অবাঞ্ছিত অনিয়মের রুদ্ধশ্বাস বলে মনে হবে তার কাছে—

দেবদারু মর্মর করে ওঠে; অশ্বত্থের ভিতর দিয়ে ল্যাজঝোলা পাখির মত হু-হু করে দক্ষিণের বাতাস উড়ে যায়—ডালপালা নড়ে—বুলবুলির পাখনা কেঁটে ওঠে—হলদে শুকনো পাতা বেঞ্চির চারদিকে ছড়াতে থাকে—বাতাসের তাড়ায় সূর্যমুখীগুলো প্রভাতের দিকে চোখ ফিরিয়ে কাঁপতে থাকে—

কয়েকটা মিনিট কেমন একটু বিহ্বল হয়ে বেঞ্চিতে বসে থাকতে হয়; কিন্তু ভাবটা কেটে যায় শিগগিরই। সুইমিং ক্লাবের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হয়। আজই বাড়ি যেতে হবে যে তাকে। সব ঠিকঠাক করে তিনটার সময়ই স্টেশনে পৌঁছুনো চাই।

মেসে গিয়ে দেখল কমলার একটা কার্ড এসেছে। বৌয়ের চিঠির সুর লড়াই-বাজ রক্তাক্ত চিলবধূর মুহূর্তের শান্তি [ফুরিয়ে যায় যেন]। মেসের কামরার ভিতর ঢুকে হাতের বস্তাটা বিছানার এক পাশে ফেলে দিয়ে প্রভাত অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়ল।

নাঃ—দেশে যাওয়া আর হবে না, গিয়ে করবে কী সে?

পরদিন সকালবেলা নিজেকে বড্ড বোকা মনে হল; একটা দিন মিছিমিছি মাটি করেছে সে। কমলা যা খুশি তা লিখুক গিয়ে কিন্তু দেশ তো কমলার নয়; মা রয়েছেন—কেতু কুকুরটা আছে—নিরঞ্জন আছে—খোকা আছে—শ্মশানে বাবার ইশারা রয়েছে—পথে-ঘাটে কত চেনা লোক—বাড়ির পুব দিকের অশ্বত্থ গাছটা—

প্রভাত সকালবেলাই তার জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখল, বাকি শুধু বিছানা বাঁধা, খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নিয়ে বেডিংটা বেঁধে ফেলবে সে—আড়াইটার সময় স্টেশনের দিকে রওনা দেবে।

আর বেরুল না কোথাও সে।

চায়ের দোকানে অব্দি গেল না। চাকরকে দিয়ে বাইরে থেকেই চা আনিয়া নিল। বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজটা অনেকক্ষণ ধরে পড়ছিল—হঠাৎ পায়ের শব্দে কাগজ সরিয়ে তাকিয়ে দেখল—চশমা চোখে একটি ছেলে এসে তার চৌকির কাছে দাঁড়িয়েছে।

প্রভাত—'আপনি কাকে চান?'

—'আপনি কি প্রভাববাবু?'

—'হ্যাঁ।'

—'কার্তিক বাবুকে আপনি চেনেন?'

—'চিনি।'

ছেলেটি প্রভাতের চৌকির উপর বসে।

—'আমি থার্ড ইয়ারে পড়ি, তিনি আমাকে পড়াতেন, কয়েক দিন হল দেশে গিয়েছেন, মাস তিনেকের ভিতর বোধ হয় ফিরবেন না আর। সামারটা দেশেই কাটাবেন—'

ছেলেটি একটু চুপ করে বললে—'তা আপনার ঠিকানা দিয়ে গেলেন আমার কাছে। বললেন যে আপনি খালাস মানুষ আছেন—টিউশন খুঁজছেন—পড়ানোর অভ্যাস-টভ্যাস আছে আপনার—'

ছেলেটি মৃদুভাবে একবার গলা খাঁকরে—'তা আছে কি?'

প্রভাত কোনো জবাব দিল না।

—'শুনলাম, আপনি আট-দশ বছর হল এম-এ পাস করেছেন; তাই না কি?' কোনো উত্তর না পেয়ে ছেলেটি বললে—'হ্যাঁ, আমি শুনেছি তাই। ছাত্র পড়াবার অভ্যাস আছে আপনার। ম্যাট্রিক থেকে বি-এ অব্দি অনেক ছেলেই পড়িয়েছেন না কি?'

ছেলেটি কুণ্ঠিত অমায়িক চোখ তুলে প্রভাতের দিকে তাকাল—

প্রভাত বালিসে মাথা রেখেই—'কার্তিক চলে গেছে নাকি?'

'হ্যাঁ দেশে গিয়েছেন।'

—'কেন?'

—'গরমের সময় এই তিন-চারটা মাস দেশেই কাটান তিনি, প্রফেসার মানুষ, ছুটিও তো কম নয়—'

—'আপনাকে তিন মাস পড়াতে হবে।'

—'তারপর?'

—'কার্তিকবাবু আসবেন।'

—'এই তিন মাসের জন্য অনেক টিউটরই তো পেতে পারেন আপনি।' ছেলেটি একটু বিস্মিত হয়ে প্রভাতের দিকে তাকাল; সামান্য একটা টিউশন পাবার জন্য কাঠপিঁপড়ের মতো মানুষের দঙ্গল কতবার তাদের বাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেউড়িতে ধর্না দিয়েছে—কলকাতা শহরের আধা আধি লোকের মাথা তার ভিতর খুঁজে পাওয়া যায়; আর এ মানুষটিকে নিজে যেচে সে কাজ দিতে এসেছে, আর তার এই রকম জবাব?

প্রভাত—'দেখুন, আমার বড্ড অবসন্ন বোধ হয়—'

—'কেন বলুন তো?'

—'আজ আমার দেশে যাবার কথা ছিল।'

—'ও, সেখানে কারো অসুখ করেছে বুঝি?'

প্রভাত—'কারো অসুখ না করলে দেশে যেতে নেই?'

—'না, তা নয় অবিশ্য, তবে আমি ভেবেছিলাম—'

—'চার বছর আমি বাড়ি যাই নি। খোকা আছেন। মা আছেন। স্ত্রী আছে। কেতু বলে একটা কুকুর আছে। এদের দেখতে ইচ্ছা করে না?'

ছেলেটি একটু হেসে বললে—'তাই তো?'

দুপুরবেলা প্রভাত বিছানা বাঁধাছাঁদা করছিল-কার্তিক এসে ঢুকল। প্রভাত চোখ তুলে—'তুমি? বাঃ, আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গিয়েছ—'

—'দার্জিলিং গিয়েছিলাম, ফিরবার পথে আবার কলকাতা হয়ে বাড়ি যাচ্ছি—'

—'ও, দার্জিলিং গিয়েছিলে বুঝি? তা দার্জিলিং কেমন জায়গা কার্তিক? বেশ চমৎকার, না? একবার গিয়ে দেখতে হবে তো! পয়সাই—বা কোথায়?'

—'তুমি তো আচ্ছা ইডিয়েট।'

—'কী রকম?'

—'সমীরকে পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে—তুমি তাকে ফিরিয়ে দিলে যে!'

—'ও, সে কথা?'

—'এমন আহাম্মক তুমি!'

—'আমি দেশে যাচ্ছি।'

—'কেন, সেখানে কোন উল্লুকের তিন হাত দাড়ি গজিয়েছে যে তোমার না কামালে চলবে না—'

প্রভাত মাথা নেড়ে—'না, সে হয় না কার্তিক—কলকাতায় আর থাকা যায় না—'

—'টাকায় কামড়ায় তোমাকে? ছেলেটা মাসে-মাসে ত্রিশ টাকা করে দেবে তোমাকে—'

—'তা দিলই-বা।'

—'বেশ তো, মেস-এর খচর চলে যাবে তোমার।'

—'তা চলে যাবে বটে। এই চার বছরও তো টিউশন করে মেসের খরচ চালিয়ে এলাম।'

—'বেশ তো, কী আর করবে! চাকরির যা বাজার তাতে এইটুকুও তো ছোট খাটো একটি যজ্ঞ ফল; পিতৃপুণ্য ছাড়া জোটে না।'

—'তা আমি জানি। এ তিন মাস এই টিউশনটা নিয়ে থাকলে চাকরি খুঁজবারও সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু কার্তিক, আকি আর কলকাতায় থাকতে পারি না—'

—'কেন?'

—'চার বছর আমি কাউকে দেখিনি কার্তিক, মাকে না, খোকাকে না, খোকার মাকে না।'

কার্তিক চুপ করে ছিল।

প্রভাত—'কেতু বলে একটা কুকুর আছে—সেটা হয় তো সারা দুপুর চনমন (চুনমুখ?) করে ঘুরে বেড়ায়! আমাকে খোঁজে। কে জানে খেতে পায় কিনা!'

দু'জনেই চুপ।

—'প্রভাত, কেতু বেঁচে আছে কিনা সে খবরও আমাকে কেউ দেয় না—নিজের স্বার্থের বাইরে মানুষ এত উদাসীন।'

কার্তিক কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে জ্বালাল।

প্রভাত—'শ্মশানে বাবার ভস্মের ওপর গোটা দুই ইট আছে; কে জানে জঙ্গলে ভরে গিয়েছে হয় তো! দুটো ইট শুধু তার, নিচে কী, কে জানে? মৃত্যুর পর আমাদের কী হয়? কী হয় কার্তিক? হয় তো এই টেবিলটা, এই দেয়ালটা, এই সিগারেটের ছাইয়ের মতই অস্তিত্ব নিয়ে পড়ে থাকি। কিন্তু তবুও এক-এক দিন কিছুতেই টিকতে পারি না যেনই এখানে; মাঝরাতে বিছানার থেকে ওঠে বসি—মনে হয় বাবা যেন আমাকে দেশে তার ঘরে গিয়ে বসতে বলছেন—শ্মশানে তাঁর চিতা বেড় দিয়ে সাপের বিড়ের মত বনচাঁড়াল আর মনসা-কাটার জঙ্গল সব—হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো বা তার নিচে মৃতের অস্তিত্ব এই দেয়ালটা, টেবিলটা, এই ধুলো, এই সিগারেটের ছাইয়ের মত কিন্তু তুবও—তবুও—কার্তিক।'

কিন্তু কার্তিকের ইচ্ছাই টিকল—

তিন মাসের জন্য সমীরকে পড়বার কাজে প্রভাতকে বহাল করে সে চলে গেলে।

তিনটি মাস বড় সহজে কাটতে চায় না—

এক-এক দিন দুপুরবেলা মনে হয়; কমলার তো বিশেষ কোনো ব্যাকুলতা নেই মনে—সেই কেমন বিমুখ উদাসীনগোছের মেয়েমানুষ—কিন্তু খোকাকে আর কেতুকে বড় ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, কোথায় ফাল্গুন মাসে দেশে যাওয়ার কথা। এখন চৈত্র ফুরুতে চলল, খোকার ছবির বই, লাটিম আর বেলুন বাক্সর ভিতর পচ্ছে। লজেনচুষগুলো গলে গিয়েছে সব, বিস্কুট কেমন মিইয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, ছাতকুড়ো পড়ে গেছে। কেতুকে হয় তো এখনো পচা বিড়াল কাকের মাংস খেতে হয়, সমস্ত দুপুর বাঁশের ঝাড়ের কাছে বসে কচ্ছপের খোলা চিবোয় হয় তো; সমস্ত দিন কুই-কুই করে একা-একা ঘুরে বেড়ায় হয় তো...কোনো কাজ নেই, দাম নেই, উপায় নেই, ভিতরের খবর জানাবার কোনো লোক নেই কোথাও; বাস্তবিক একটা কুকুর যখন একটা সাথীহীন হয়ে পড়ে তখন নিঃসঙ্গ মানুষের চেয়েও ঢের বেশি কষ্ট তার।

কে জানে কেতু বেঁচেই-বা আছে কি না?

এক-এক দিন গোলদিঘিতে ঘুরে-ঘুরে ঘুরে-ঘুরে অবসন্ন হয়ে রাত্তিরবেলা বিছানায় এসে শুয়ে প্রভাতের মনে হয় দেশের বাড়িতে এতক্ষণে মার সঙ্গে আর কমলার সঙ্গে কথা বলে নিস্তার পেয়ে বাঁচত সে; কিংবা নিরঞ্জনকে নিয়ে অশ্বত্থ গাছের কাছে তামরুল আর ঘাসে ঢাকা বাঁধানো পৈঠার উপর বসে রক্তাক্ত সংগ্রাম থেকে ছুটি নিয়ে বৈতরণী পারের স্তিমিত ও নরম অন্ধকারের মতো শান্তি ও আশ্বাসে পাড়াগাঁর রাত্রি—

মা-র চিঠিতে খবর পেয়েছে প্রভাত, যে উষা দেশে এসেছে, প্রভাতদের পাশের বাড়ির অক্ষয়বাবুর মেয়ে উষা আহা, সে এসেছে! আবাল্য তার সঙ্গে মুখের আলাপ রাখে নি কোনোদিন প্রভাত, এমনই লাজুক। কিন্তু কত দিন ধরে এই মেয়েটিকে দেখে এসেছে প্রভাত নম্র, স্নিগ্ধ, বিচক্ষণ, নিঃশব্দ। অন্ধকার রাতে কাঁঠাল—হিজলের জঙ্গলের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে যেমন ভাল লাগে—এই মেয়েটিকেও তেমনি লাগে—

দু-তিন বছর উষা দেশে ফিরল—অথচ এই সময়ে নিজে সে দেশে থাকতে পারল না। রাতে গান গাওয়ার অভ্যাস এই মেয়েটির—রোজ রাতেই সে গায়; কেমন গভীর আত্মনিবেদন আত্মসমর্পণের গান-নারীর সজীব সাধক হৃদয়ের থেকে উচ্ছিত হয়ে উঠেছে। তাই এমন নিবিড়ভাবে সরস।

এবারও কি উষা গায়?'

এখানে গভীর রাতে মেসের ঝি সৈরভীর গলা খনখন করে ওঠে—ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া না ইয়ার্কি ঠিক বুঝতে পারা যায় না। রাতের অনেক কটা মুহূর্ত—অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই কর্কশ বৈচিত্র্যহীন মূল্যহীন গলা নিজের ঢাক পিটিয়ে চলে।

অবাক হয়ে ভাবে; জীবনের বিচিত্র নিয়ম—এমন রাতে।

এক-এক দিন সন্ধ্যার সময় টালিগঞ্জের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে দেশের শ্মশানের কথা মনে হয়-বাবার মঠের কাছে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করে—

চৈত্রের করুণ বাতাসের ভিতর দিয়ে কে আসে?—উড়ো শুকনো পাতা? বুরকি? কাঁকর? খড়? হ্যাঁ, বাবার গলাও যেন—সেই দূর শ্মশান থেকে যেন ডাকছেন 'খোকা, তুমি আমার কাছে এসে একটু বসো—আমি শান্তি পাই। কলকাতার পথে-পথে হতভাগা ছেলে তুমিই-বা কত দিন এই মনের অশান্তি নিয়ে কাটাবে?'

চৈত্রের বাতাস উড়ে ভেসে চলে যায়; টালিগঞ্জের থেকে পায় হাঁটতে-হাঁটতে ট্রাম-বাস-ট্রাক-গ্যাস লাইটের একটা বিপুল উন্মাদনার ভিতর এসে পড়ে প্রভাত। কী নিয়ে এত উন্মাদ? এতে কার কী লাভ?

দেখতে-দেখতে তিন মাস প্রায় শেষ হয়ে এল।

সমীর একদিন বললে—'আপনি স্কুলের মাস্টারি পেলে নেন?'

—'তা নেই অবিশ্য।'

—'কোথায়?'

—'আপনার ভয় নেই—কলকাতা ছাড়তে হবে না।'

প্রভাত মাথা নেড়ে—'না, কলকাতা তো আমার এমন একটু প্রিয় জিনিস নয় সমীর—'

প্রভাত একটু চুপ থেকে—'এক-এক সময় পথ ঘাট একেবারে দুঃসহ হয়ে ওঠে—যে কোনো জায়গায় পালিয়ে যেতে পারলে আমি বাঁচি।'

—'মাস্টারিটা কলকাতায় অবিশ্য। বাবার স্কুল—বাবা সেক্রেটারি। তা বসে আছেন, নিন না—'

প্রভাত কোনো উত্তর দিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমীর—'ছ-মাসের জন্য কাজ, ডিসেম্বর অব্দি—করবেন?'

প্রভাত—'ভাবছিলাম দেশে যাব।'

—'দেশে তো সব সময়ই যেতে পারেন।'

—'মনসা কাশীং গচ্ছতি; মনসাবাবু কাশী যায়, না মনে-মনে কাশী যায়।'

—'কেন, ট্রেনে-স্টিমারে করে যেতেই-বা কী বাধা?'

-'বাধা আমি নিজেই।'

—'কী রকম?'

—'নিজেকে যতটা প্রেমিক মনে করি ততটা আমি নই—তাই যদি হতাম তা হলে সেই যে তিন মাস আগে বিছানাপত্র বেঁধে যাচ্ছিলাম, চলেই যেতাম, কেউ আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত না—'

সমীর একটু চুপ থেকে—'কিছু মনে করবেন না—আপনার দাম্পত্যজীবন বেশ নির্বিবাদ? মানে সুখের? কী বলেন'?

প্রভাত একটু হেসে—'বাঃ! একথা জিজ্ঞেস কর কেন তুমি?'

—'আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ বেশ শান্তির তো?'

—'যেমন সচরাচর হয়।'

সমীর কেটু চুপ থেকে হেসে বললে—'আপনি বলছিলেন কি না নিজেকে যতটা প্রেমিক মনে করেন ততটা নন—সেই জন্যেই কেমন কৌতূহল হল—জিজ্ঞেস করলাম। পুরুষ-মহিলার সম্বন্ধ নিয়ে আমি একটা আলোচনা করছি-প্রবন্ধও লিখি—'

প্রভাত একটু হেসে—'আজকালকার ছেলেরা আমাদের চেয়ে ঢের প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। এই বয়সে আমরা তেতুলবিচি নিয়ে খেলা করতাম—'

প্রভাত একটু চুপ থেকে—'প্রেম বলতে তোমরা নর-নারীর নানারকম সম্পর্ক বোঝ—কী বলো সমীর? কিন্তু আমি ঢের জিনিস বুঝি—স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধই শুধু নয়; দেশের মাঠ, পথ, সেই স্কুলের বাড়ি, অশথ গাছটা, খোকা, বা কেতু।'

স্কুলের কাজ নেবার কোনো ইচ্ছা ছিল না প্রভাতের কিন্তু মানুষের সাংসারিক লাভ-ক্ষতির ব্যাপার প্রভাতের চেয়ে সমীর ঢের বেশি ভাল বোঝে।

প্রভাতকে ছাড়ল না- একেবারে তার বাবার কাছে নিয়ে গেল। তাঁর কথামত কাজটার জন্যে একটা দরখাস্ত করতে হল। পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের কাজ—ছয় ঘণ্টা পড়াতে হয়—পাঁচ-ছয় দিন মাস্টারি করার পর প্রভাত কমলার চিঠি পেল; কেতু মরে গেছে, খোকারও হুপিং কাফ, রক্ত আমাশয়। কিন্তু স্কুলে প্রভাত মাস্টারি পেয়েছে শুনে কমলা খুব খুশি।

কমলার এ চিঠি পাওয়ার পর অনেক কটা দিন প্রভাত স্কুলের থেকে ফিরে নিজের ঘরে অবিশ্রাম পায়চারি করতে-করতে ভাবত ঃ জীবনে ব্যবসাবোধ মেয়েমানুষের কী ভয়াবহ!

এমন অবসাদ বোধ হয়!

সারাটা দিন হাতে খড়িমাটির রং লেপে থাকে—স্কুলের থেকে ফিরে এসে ধীরে-ধীরে সেগুলো ঝেড়ে ফেলে প্রভাত; এক-এক দিন সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেরিয়ে কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেখে দু-তিনটি চকের স্টিক—ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে-লিখতে পকেটেই ফেলে রেখেছিল না জানি কখন—ইতিহাস জিওগ্রাফির কয়েকখানা ট্রেক্সট জোগাড় করে নিতে হয়েছে—দিনরাতের অনেকটা সময়ই এই বইগুলো নেড়ে চেড়ে দেখতে হয় তার; ভাল করে ম্যাপ আঁকা শিখতে হয়, ইতিহাসের সন তারিক মুখস্থ রাখতে হয়।

মাঝে-মাঝে রাস্তার ওপারে পানওয়ালার দোকানের দিকে তাকিয়ে ভাবে—কেতু গেল মরে! কেউ ঠেঙিয়ে মারল না কি? নিজের থেকেই মরে গেল? প্রভাত বাড়িতে না-যেতেই মরে গেল। একটু অপেক্ষাও করতে পারল না? আর ফিরবে না কোনোদিন? কোনোদিনই ফিরবে না? বাস্তবিক কোনোদিনই ফিরবে না আর?

জিওগ্রাফি, ইতিহাস যত সোজা মনে করেছিল সে তা নয়; সেই কবে আঠার-কুড়ি বছর আগে স্কুলের নিচের ক্লাসে এ-সব পড়েছিল সে, এ সবের একটা কথাও কি এখন মনে আছে তার! ইতিহাস ও ভূগোলের অসংখ্য রাশি-রাশি ব্যাপার ও বিষয়ের সমাবেশ বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা করে না, কল্পনার না, কবিত্বের না, স্মরণশক্তির ওপর জুলুম করে শুধু।

বড্ড অবসাদ বোধ হয়।

এক-এক দিন ক্লাসে ভূগোল ও ইতিহাসের নানারকম খুঁটিনাটি ভুল নিজেই সে করে ফেলে; ছেলেরা বড় একটা ধরতে পারে না। কিন্তু নিজের মনের কাছে বড় লজ্জা পায় সে।

কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল অঙ্ক নিয়ে। উপরের ক্লাসের জ্যামিতি পড়াবার ভার তার ওপর। ছেলেরা কঠিন-কঠিন এক্সট্রা নিয়ে এসে হাজির হয়। কাজেই বাড়িতে বসে গত তিন মাস অনেক আঁট-ঘাঁট করে তৈরি হয়ে যেতে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে। ইংরেজির মানুষ প্রভাত। অথচ তাকে ইংরেজি পড়াতে দেওয়া হয় না। এক দিন হেডমাস্টারকে সে- 'আমাকে ইংরেজি পড়াতে দিন।'

—'তা হয় না।'

—'কেন?'

—'আপনি যার জায়গায় এসেছেন তিনি হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি -জিওমেট্রিই পড়াতেন।'

প্রভাত—'তিনি কী পাস করেছিলেন?'

—'এল-টি।'

হেডমাস্টার কাগজপত্র নাড়তে-নাড়তে গম্ভীরভাবে—'তা ছাড়া তিনি টেকনিক্যাল স্কুলেও পড়েছিলেন।'

একবার গলা খাঁকরে নিয়ে—'ড্রিল করাতেও পারতেন।'

হেডমাস্টার প্রভাতের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না—কেমন একটা রাশভারী চাল বজায় রাখেন ও পড়াবার কাজের থেকে অফিসের কাজই তাঁর বেশি; অনেকটা সময় বসে নিজের কী একটা কম্পোজিশনের বইয়ের প্রুফ দেখেন। নতুন ম্যানুয়াল লেখেন, লম্বা কালো দাড়ি, সোনার চশমা, পরেন সাদা পেন্টালুন, গলাবন্ধ তসরের কোট বুক পকেটে থেকে সোনার চেন ঝুলছে। স্কুলের পাঁচিলের কাছে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ—সমস্ত স্কুলটার ভিতর এই যেন একটু জীবন।

আর এই ছেলেরা।

কিন্তু মাঠ প্রান্তরের কুয়াশার বিস্তৃতি, কাঁচপোকানীল কাজলস্নিগ্ধ বট, অসংখ্য ডালপালা গুঁড়ি জড়িয়ে অজগরের মত সহস্রধারা লতা, মৃদু বেগুনি ফুল, লাল বটফলের দিকে সহস্র শালিক কোকিলের কৌমার্যভার, আনন্দ; বির্শালি, অশ্বত্থ, পাকুড়, হিজল, জামের ডালপালার ফাঁকে রাত্রির তারা, জ্যোৎস্নার চাঁদ, দিনের অপরিমেয় আকাশের গন্ধ, চট বাবলার জঙ্গল ও ঝিঁঝির ডাকের ভিতর মানুষ হয়েছিল যারা সেই সব ছেলেদের কথা মনে পড়ে। এদের মুখের দিকে তাকালে তাদের কথা মনে পড়ে কেবল; তারা কত অন্য রকম। দেশের বাড়ির সেই স্কুলটা চোখের সামনে জেগে ওঠে; সেই কুড়ি বছর আগের অমূল্য, বিজন অবিনাশ রুক্মিণী—

দিনের পর দিন কেটে যায়।

মার চিঠিতে জানা যায় হেমন্ত কিছু দিন হল দেশে ফিরে এসেছে; এখনো সে সেই মঠেরই সন্ন্যাসী; অনেক জায়গা ঘুরেছে; মাথা মুড়নো—গেরুয়া কাপড় গায়ে, পায়ে একটি কাঠের খড়ম—

আহা, হেমন্ত তা হলে দেশে ফিরল আবার? সেই সময়ে দেশে থাকলে বেশ হত!

দেশের স্কুলেই তারা দু'জনে পড়েছিল—হেমন্ত এক ক্লাস উপরে পড়ত; কলেজে উঠেই সে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়।—

স্কুলে থাকতে একটা ঘড়ি দিয়েছিল প্রভাতকে সে; রোজ শেষ রাতে অন্ধকার থাকতে প্রভাত হেমন্তকে ডেকে নিয়ে বেরুত সেই এক ক্রোশ দূরে মধুমুখী দিঘির থেকে পদ্মফুল তুলবার জন্য। পথে একটা শেয়াল একদিন রুখে এসেছিল দু'জনকে; সে কী ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় প্রভাতের—পিছনে হেমন্ত ছুটতে-ছুটতে চেঁচাচ্ছিল, 'ওরে প্রভাত, থাম-থাম, শেয়ালটা পালিয়ে গেছে-থামবি না রে।'

প্রভাতের মাকে মা বলে ডাকত; কত দিন কত কাজে-অকাজে প্রভাতের কাছে এসেছে সে—।

কলেজে উঠেই খুব টলস্টয় পড়ত হেমন্ত—টলস্টয়ের উপন্যাস নয়—অন্য বইগুলো। দেখে শুনে প্রভাত এমন ঠাট্টা করতে তাকে—

কদম ফুলের মতন চুল ছাঁটত—বিছানার চাদর গায়ে দিত-বিস্তর নিরস নিষ্ঠুর বই পড়তে সে—কিন্তু নিজে খুব হাসি-তামাশা মজলিশের লোক ছিল—একদিন কলেজে তাকে আর দেখা গেল না—সেই থেকে সন্ন্যাসী—

হেমন্তর জীবন একটা শ্মশানের খালের কিনারে রহস্যময় ফণীমসনার জঙ্গলের মত গেল ন্যাড়া হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে।

বছর পাঁচেক আগে হেমন্ত যখন দেশে এসেছিল প্রভাত ওকে কমলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। কমলা প্রণাম করল না। কিন্তু হেমন্ত খুব হৃদয়ের প্রসাদে আশীর্বাদ করল—একেবারে ঘোমটার ওপর পাঁচটি আঙুল চেপে—তার পর বললে—'যাক, নাকের ডগা অব্দি ঘোমটা টানো নি যে এই জন্য তোমাকে ঢের ধন্যবাদ।' কমলার ঘোমটা নিঃসংকোচে ধরে টেনে সিঁথির সিন্দুর অব্ধি উঠিয়ে দিল সে—

বললে—'তোমরা যে কথা বলবে মেঝে ফেটে যাবে।'

কমলা বললে না কিছু। কিন্তু বুঝলাম হেমন্ত আবার বাকশক্তি ফিরে পেয়েছে ও শব্দব্রহ্মে তার খুব বিশ্বাস।

হেমন্ত—'তোমাদের এই চিৎপটাং কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ির মত ভাবগতিক দেখে ইচ্ছে হয় যে কোথাও লুকিয়ে যাই!'

গতবার বলেছিল—'পাঞ্জাব-মিরাট-পেশোয়ার-অমরনাথ-বদ্রীনাথের দিকে চললাম রে ভাই! ফিরব কি না শঙ্করী জানেন!'

বাস্তবিক!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে ফিরেছে সে এবার; দেশের চণ্ডীমণ্ডপ, বারোয়ারিতলা, বৈঠকখানা, পথ-ঘাট, মাঠ-প্রান্তর জমিয়ে রাখবে সে কয়েকদিন।

দিনের পর দিন কেটে যায়—

দু'মাস চলে গেল—আরো চার মাস বাকি।'

মা লিখেছেন; খোকা বেশ গাইতে পারে। কমলা লিখেছে; খোকা পড়াশুনা করে না কিছু, ঘরে থাকে না মোটে, সারা দিন কামার পাড়ায় টইটই করে বেড়ায়। নচ্ছার ছেলেদের সঙ্গে মেশে; রোজই পাড়ার ছেলেদের লাথি কানমলা খেয়ে আসে। ছেলেটার যেন মা-বাবা নেই? সেদিন পায়ে একটা মাদার কাঁটা ফুটিয়ে আনল—

পড়তে-পড়তে চিঠিটি রেখে দেয় প্রভাত—

চুরুটটা জ্বালিয়ে নেয়। এই তো বেশ ঃ সেই ছ'মাসের নিঃসহায় শিশু ক্রমে-ক্রমে মানুষ হয়ে উঠছে। মুহূর্তে-মুহূর্তে জীবনের সঙ্গে পরিয়ে লাভ করছে। প্রায় পাঁচ বছর আগে, যে ছোট্ট টুকটুকে পা দুটো দেখে এসেছিল সে আজ তা কাঁটা ফুটিয়ে নেবার মত উপযুক্ত হয়ে উঠল। কে জানে ভবিষ্যতের কোনো এক ভয়ংকর যুদ্ধে এই পা হয় তো ট্রেঞ্চের ভিতর ছুটে বেড়াবে—

এর পর নিজের জীবন সংগ্রামও প্রভাতের কাছে অনেকটা লঘু বোধ হয়। কিন্তু রাতের বেলা মনের ভেতর কেমন যেন করতে থাকে প্রভাতের; কমলা লিখেছে ছেলেটার যেন মা-বাবা নেই। সারা দিন কত ছেলের তত্ত্বাবধান করে প্রভাত—আর নিজের ছেলেটা পথে-পথে ঘুরে মরে।

আরো গভীর রাতে প্রভাতের মনে হল ঃ পাঁচ বছর আগে লাল তুলতুলে ছোট্ট যে দুটো পা সে দেখে এসেছিল—ছোট্ট দুটো হাত-দেশে গিয়ে এবার আর সে সব দেখবে না সে। ছেলেকে কথায়-কথায় কোলে তুলে নেওয়ারও একটা অসভ্য জিনিস হয়ে দাঁড়াবে—খোকা তা প্রত্যাশাও করবে না; বাপও লজ্জিত হবে—ছেলে নিজেই লজ্জা পাবে সবার চেয়ে ঢের বেশি! আদর করতে গেলে এড়িয়ে যাবে, ছুটে পালিয়ে যাবে ছেলেটি। আদর করবেই বা কী—সেই নরম বিচিত্র শত-পাই বা কোথায় খোকার—সেই রেশমের মত চুল—টুলটুলে গাল—কোথায় গেল সে সব? খোকার জীবনের কে এমন ভয়াবহ মুণ্ডচ্ছেদ করল? প্রভাতের কোনো অনুমতির জন্যও অপেক্ষা করল না?

মানুষের জীবনের গতি বড় তীব্র; কমলার মুখও হয় তো এত দিনে থুবড়ে পড়েছে—

মা-ও না জানি কতখানি বুড়ো হয়ে গেছেন—

সমস্ত রাত মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে একটার পর আর একটা কথা ভাবতে লাগল প্রভাত। একটা কথাও মানুষকে ভরসা দেয় না—কেমন করে তোলে—

পর দিন সকালবেলা কিছুতেই আর উঠতে পারা যায় না যেন—

মস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে—গায়ে কেমন অসহ্য ব্যথা—

কিন্তু তবুও স্কুলের বেলা হতে না-হতেই উঠে বসল প্রভাত; কিছু না খেয়েই বাসে করে স্কুলে চলে গেল। প্রথম দুই ঘণ্টা কর্কাতে-কর্কাতে পড়িয়ে নিজেকে কেমন অমানুষ বলে বোধ হতে লাগল প্রভাতের—নিজের উপর এ কী অত্যাচার তার।

মানুষ কি স্কুল মাস্টারি করবার জন্যই বেঁচে থাকে না কি?

ঘণ্টা বাজাতেই হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে ছুটি চাইল সে!

হেডমাস্টার—'আপনার টেম্পোরারি কাজ, দু'ঘণ্টা পড়িয়েই ছুটি? কেন, কী হল আপনার?'

—'বড্ড অসুখ করেছে।'

—'অসুখ তো করবেই-আমাদের লোক বড্ড কম—এখনই তো অসুখের সময়—অসুখ না করলে চলে। এত কাজ করে কে?'

প্রভাত দাঁড়াতে পারছিল না।

হেডমাস্টার—'কী আর করা; যান—অসুখ যখন করেছে—কাল দু-এক ঘণ্টা বেশি পড়িয়ে দেবেন বরং।'

মেসে ফিরে এসে প্রভাত ঠিক করল আজই সে দেশে চলে যাবে। বাক্স-বিছানা গোছাতে গোছাতে প্রভাত ভাবল মানুষ যদি এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে তা হলে জীবন তাকে মনে করে অপদার্থ সব, সময় আসে শকুনের মত উড়ে, তাই আসে—তাই আসে। এ পাঁচ বছর ধরে কী করে এত অসতর্ক—অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সে—জীবনের হাতে এত প্রতারণা সহ্য করল। এত অসম্ভব অদ্ভুত ব্যাপার কী করে যে ঘটে!

কিন্তু এই সৃষ্টি যার কাছে আঁতুড় ঘরের জননীর মত মমতা প্রত্যাশা করা অসম্ভব, যা অন্ধ অবসাদে চলে-অন্ধকারে ভাঙা সর্পিল সেতুর মত—নিঃসহায়তার নির্মমতায় করে অপপ্রয়োগ, নিরবচ্ছিন্ন অপচেষ্টায় শানিয়ে ওঠে।

বিছানা বাঁধতে-বাঁধতে প্রভাত ভাবল—মানুষ ক দিনই বা বাঁচে, বাঁচে না বেশি দিন। টাকাকড়ি সফলতাও খুব কম মানুষের জীবনেরই হয়। কিন্তু কয়েকটা ভালবাসার জিনিস আমাদের জন্য সে রেখে দেয়। সে সবের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে লাভ কী? অন্ধকার সে অসংস্থিতি, খেয়াল যার এত অন্ধ, সে কখন কী কঠিনতা করে বসে তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.org

আরো একটা দড়ির দরকার; প্রভাত খাটের নিচের থেকে একটা মস্ত বড় লম্বা দড়ি বের করে বিছানাটা বাঁধতে-বাঁধতে ভাবল—এ পাঁচ বছর জীবনটাকে নেড়েচেড়ে দেখলাম, সংসারে যারা সফল হবে তাদের জাত আলাদা ঃ ভালবাসার চেয়ে সফলতাকেই তারা ভালবাসে বেশি—আমার ঠিক উল্টো, প্রেম, দাক্ষিণ্য, মমতার, ঘরানা গন্ধেই তৃপ্তি! যে যা ভালবাসে সেই জিনিসেরই আরাধনা করা উচিত তার। নিজের জীবনটাকে ভুল বুঝে মিছিমিছি অন্ধ হয়ে ঘুরে কী লাভ।

দেশের বাড়িতে একটা মনিহারি দোকান খুলে বসবে সে—কিংবা দেশের স্কুলে একটা মাস্টারির চেষ্টা দেখবে—

বিছানা—বাক্স বাঁধা হয়ে যাবার পর শরীরটা ভাল লাগতে লাগল; জ্বরটা যেন চলে গেছে।

প্রভাতের চিন্তার গতি আবার অন্য পথ ধরল। চেয়ারে সে সুস্থির হয়ে চুপ করে বসল; একটা চুরুট ধরে নড়াচাড়া করতে লাগল—ভাবল; হুজুকে কোনো কাজ করা উচিত নয়। জীবন হচ্ছে লড়াইবাজ বাজপাখির বিশাল আকাশ এবং সংগ্রাম উজ্জ্বল, আশানীলাভ বিরাট পরিবিস্তৃত আকাশের মত এই জীবন। যারা দুর্বল তারা পিছিয়ে পড়ে, মায়া-মমতার দোহাই পাড়ে—জীবনের ভিতর বিধাতার খেলা দেখে শুধু—অনিয়ম দেখে—উচ্ছৃঙ্খলতা, দেখে—তা নয়-তা নয়।

চুরুটটা জ্বালিয়ে এক টান দিয়ে প্রভাতের মনে হল—জীবনকে হয়ত বিধাতার আস্তাকুড় মনে করে চুপ করে থাকে যারা তাদের ক্লান্তি, গ্লানি, বেদনা সমস্তই নিজেদের তৈরি জিনিস; তারা উপলব্ধি করতে ভয় পায়—জীবন্মৃত হয়ে থাকতে ভালবাসে; অলসতাকে তারা ভাবে প্রেম—ভিক্ষাকে ভাবে দাক্ষিণ্য। মানুষের জীবনের আবহমান স্রোতের ভিতর যে সুন্দর নিয়ম আছে তাকে উপেক্ষা করে মাছির ডিমের মত। এই সংসারে কোটি-কোটি জন্মায় তারা কোটি-কোটি গুঁড়িয়ে যায়—

প্রভাত চুরুটে টান দিতেই ভাবল; পাঁচ বছর বসে প্রাণপাত করে—জীবনের সমস্ত অপচয় অপবিন্যাসের থেকে দূরে থেকে জীবনটাকে যেখানে এনে দাঁড় করিয়েছি আমি এ খুব ভরসার পথ। নীলমণি বাবুর স্কুলে চার মাস ধরে বেশ একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করেছি—কখনও কর্তব্য অবহেলা করি নি—বেশ সুনাম হয়েছে আমার—ছেলেরা খুশি—মাস্টাররা খুশি—সেক্রেটারি খুশি-হেডমাস্টারও বিমুখ নন—

চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে প্রভাত স্বীকার করে নিল—কাজ পাকা হয়ে যাবে তার। বিছানা খুলতে-খুলতে ভাবল—পাকা হয়ে গেলে চল্লিশ টাকা মাইনে হবে—চল্লিশ টাকার একটা পাকা কাজ নিয়ে কলকাতায় বসে সে অন্য চেষ্টা করবে—হয় তো আর-একটা এম-এ দেবে—হয় তো থিসিস লিখবে—হয় তো বি-টি পড়বে—

প্রভাত বিছানাটা পুরোপুরি খুলে পেতে নিল—বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সমস্ত দুপুর সমস্ত বিকাল সে ঢের উজ্জ্বলতায় ও জীবনের সুবিন্যাসের স্বপ্ন দেখল। সন্ধ্যার মুখোমুখিই জ্বর এল আবার—

সংসারের বাজপাখি নয়, চড়ুই পাখি—শালিক পাখি এই উদাসী, করুণ, সংসারের কর্তব্য সংগ্রাম নিষ্পেষিত যুবক ক্রমে-ক্রমে জ্বরে বেঁহুশ হয়ে পড়তে লাগল।

খুব খিদে পেল। খোকার জন্য প্রায় সাত মাস আগে সেই যে কয়েকটা খুচরো বিস্কুট কিনেছিল বাক্সর থেকে সেগুলো বের করে নিল প্রভাত; গুণে দেখল পনের খানা; এখন মিইয়ে তুলোর মত হয়ে গেছে; খেতে কেমন খড়ি মাটির মত লাগে—কোনো স্বাদ নেই কিন্তু তবুও কয়েকখানা খেল সে—বাকিগুলো বিছানার এক পাশে ছড়িয়ে রইল। লজেনচুষগুলো গলতে—গলতে শেষে এক সময় চট বেঁধে শক্ত হয়ে রয়েছে—দু-একটা খুঁটে মুখে দিয়ে ডান কাতে শুয়ে লজেনচুষের মোড়কটা অনেকক্ষণ হাতের ভিতর রেখে দিল সে—লজেনচুষ বিস্কুট খোকা সেই সাত মাস আগের সেই বিছানা বাক্স বাঁধা, বাড়ি যাবার আয়োজন, দেশের বাড়ি, সেই কেতু যে দিল ফাঁকি, সেই খোকা যার শিশুত্ব গেল নষ্ট হয়ে, সেই মা যার নিজের হাতে লেখা চিঠি আর আসে না, তিন মাস ধরে নিয়েছেন বিছানা, বাবার চিতার উপর বিষাক্ত সাপের মত কেলেকাঁটা খেলছে যে—একটা ডগা ছিঁড়ে পরিষ্কার করবার পর্যন্ত কোনো লোক নেই, সেই অশ্বত্থ গাছটায় পর-পর দু'জন লোক গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে বলে সেই গাছটাকেই নাকি কেটে ফেলেছে—অপরাধ হল গাছের? এমন সবুজ ফলন্ত গাছকে কেউ কাটে? এবার গিয়ে ভাল দেখে আবার একটা অশ্বত্থের চারা লাগাতে হবে কিন্তু কত দিনে বাড়বে বিধাতা জানেন—বড় আস্তে বাড়ে। কমলার সামনের মাড়ির পাঁচ-ছটা দাঁত পড়ে গেছে। বাঃ কেমন দেখায় তাকে। ছাই দিয়ে দাঁত মাজে! কত দিন প্রভাত তাকে আমের কচি ডাল দিয়ে দাঁত মাজতে বলেছে।—বাস্তবিক, কেতু আর নেই? মা বিছানার থেকে নামতে পারেন না আর?

নিরঞ্জন ধোপার খবর কেউ লেখে না—মরল না কি? কমলা ফোকলা দাঁতে দিন-রাত কথা বলছে, খোকাকে শাসাচ্ছে, হয় তো—হাসছে-কে জানে—কাঁদছেও হয় তো। এ কী রকম যেন হয়ে গেল। জীবন যেন তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করে দিতে চায় নিজেকে। প্রভাতের বুকের ভিতর কেমন যেন শূন্য বোধহয়, বড্ড কষ্ট লাগে কমলার জন্য। কেতুর সঙ্গে মাঠে জঙ্গলে উঠানে কোথাও কোনোদিন আর দেখা হবে না?

এই সব অনেক কথা ভাবতে-ভাবতে শরীরটা কেমন অবশ হয়ে আসে। লজেনচুষের মোটড়কটা হাতের থেকে খসে পড়ে যায়—লাল-নীল নজেনচুষগুলো বিছানায় গড়াগড়ি খেতে থাকে।

সারারাত ছট-ফট করে সকালবেলা যখন সে মারা গেল তখন তার অসুখের খবরও কেউ জানে না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~